গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ জুলাই ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা

আজও সেই গোলামির মানসিকতা!

‘মেদিনীপুরের তিন জেলাশাসকের নাম করো, যাঁরা সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিহত হন।’

হ্যাঁ, সম্প্রতি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সেমিস্টারে ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে এমনটিই জানতে চাওয়া হয়েছে।

মেদিনীপুরের বীর বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, প্রভাংশু পাল, অনাথবন্ধু পাঁজা, মৃগেন দত্ত, রামকৃষ্ণ রায় প্রমুখ যাঁরা নিজেরা মৃত্যুবরণের প্রতিজ্ঞা নিয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ জেলাশাসক পেডি-ডগলাস-বার্জকে হত্যা করে দেশবাসীর উপর চরম নিপীড়নের জবাব দিয়েছিলেন, তাঁদের এই ভাবে ‘সন্ত্রাসবাদী’ আখ্যায়িত করল বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়! যাঁরা আজ বিপ্লবীদের সম্পর্কে এমন এক লজ্জাজনক শব্দ লিখলেন, তাঁরা কি বিপ্লবী স্বাধীনতা যোদ্ধা এবং সন্ত্রাসবাদীর পার্থক্য বোঝেন? ব্যক্তির কিংবা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থে হত্যা বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিলে তা সন্ত্রাসবাদী কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীরা কি তাই ছিলেন? যাঁরা সমগ্র দেশের মুক্তির জন্য, শোষণ, অত্যাচার, দারিদ্র, ক্ষুধার হাত থেকে দেশের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, জীবনকে নিঃশেষে উৎসর্গ করেছেন তাঁরাই

তিনের পাতায় দেখুন

বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিজেপি সরকারের নিপীড়ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

বাংলায় কথা বললেই ‘বাংলাদেশি’?

এমনই সমীকরণ দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। আর তারই ভিত্তিতে বিজেপি শাসিত গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ওড়িশা, আসাম, দিল্লি ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে শয়ে শয়ে বাংলাভাষী এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরিব মানুষকে কেবলমাত্র সন্দেহের বশে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হয় ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করা হচ্ছে, নয়তো সীমান্তের ওপারে স্রেফ ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। বাংলায় কথা বলার ‘অপরাধে’ বৈধ নাগরিক পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও উত্তর ২৪ পরগণার স্থায়ী বাসিন্দা ফজের মণ্ডলকে সস্ত্রীক বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। একই অভিজ্ঞতা মুর্শিদাবাদের মিনারুল শেখ, নিজামুদ্দিন শেখ, পূর্ব বর্ধমানের মোস্তাফা কামাল শেখদের। মিনারুল বলছেন, ‘বিএসএফ জওয়ানরা বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়েছিল। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বের করে দিয়ে বলেছিল ফিরে যদি তাকাস তা হলে গুলি করব।’ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে দেশে ফেরার পর আপাতত স্বস্তি মিললেও আচমকা দেশহীন হয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে তাঁরা গভীর বিপন্নতার সম্মুখীন। বীরভূমের মুরারই ১ ও ২ নং ব্লকের ৮ শ্রমিককে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ। ওড়িশার বিজেপি সরকার বাংলাভাষী ৪৪৪ জন শ্রমিককে আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে চালান করেছে। এই শ্রমিকরা মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় কাজে গিয়েছিলেন।

শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানুষই নন, ত্রিপুরা, আসাম, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের একটা বড় অংশের মানুষ বাংলায় কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গ ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা প্রভৃতি নানা কারণে যাতায়াত এবং বসবাসের অধিকার প্রতিটি ভারতবাসীর রয়েছে। এই অবস্থায় বাংলায় কথা বললেই কাউকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়? দাগিয়ে দিলে তা প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নেই? তিনি যে ভারতেরই নাগরিক তা প্রমাণের দায় কেন অভিযুক্তের ঘাড়ে চাপবে! এই দায় তো অভিযোগকারীর নেওয়ার কথা! কাউকে বাংলাদেশি সন্দেহ হলে তিনি ‘প্রকৃতই বাংলাদেশী’ কি না তার বিচার তো আইনি পথেই করতে হবে। পুলিশ বা বিজেপি-আরএসএসের গেস্টাপো বাহিনীকে এই অধিকার কে দিয়েছে? তাদের ভাবটা এমন, যেন সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর সব পরিচয়পত্রই জাল। বাংলায় কথা বললেই গভীর রাতে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করে, টাকা-নথিপত্র, মোবাইল

দুয়ের পাতায় দেখুন

৯ জুলাই ধর্মঘটের সমর্থনে সর্বত্র পথে নেমেছেন মেহনতি মানুষ

● *ধর্মঘটের দিন রায়গঞ্জে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশীকে*

● *কোচবিহার শহরে এআইইউটিইউসি কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ*

কোচবিহার জেলার ১৫টি লোকালে এআইইউটিইউসি এবং এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে মিছিল হয়েছে। তুফানগঞ্জে টিএমসি হামলা চালায়। দু-জন আহত হন। গুরুতর আহত হন অর্জুন বর্মন। এ ছাড়া কোচবিহার শহরে, দিনহাটাতেও পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয়েছে। কোচবিহার শহরে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৩৪ জন, দিনহাটায় ৩০ জন, তুফানগঞ্জে ৮ জন। মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭২ জন, যার মধ্যে মহিলা ১৪। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে আহত হয়েছেন চন্দনা ভুঁইমালি, প্রবীর সেন, দেবাশীষ অধিকারী।

দার্জিলিং-এ মিছিল হয়েছে সব জায়গায়। ব্যাংকে পিকেটিং হয়েছে। কোর্ট বন্ধ ছিল। অল্প কিছু গাড়ি চলেছে কম যাত্রী নিয়ে। আলিপুরদুয়ারে গ্রেপ্তার হয়েছেন চার জন, ফালাকাটায় দুজন। উত্তর দিনাজপুরে দুলাল রাজবংশী সহ তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। কলকাতায় সর্বত্র মিছিল হয়েছে। হাজরায় একজন মহিলা সহ ৮ জন গ্রেফতার হয়েছেন। কাকদ্বীপে ঢোলাহাট-রামগঙ্গা রোডে বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলেছে। জলপাইগুড়িতে মিছিল ও অবরোধ চলেছে। বারুইপুরে সকাল থেকে ঘটিহারানিয়াতে অবরোধ হয়েছে, মিছিল হয়েছে জামতলা, প্রিয়র মোড়, মণিরতটে। হাওড়ায় বেলুড়, বালি ও হাওড়া শহরে মিছিল হয়েছে। হুগলিতে ১১টি চটকলে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে। ডানকুনি শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘট সর্বাত্মক। নটি কারখানায় এআইইউটিইউসি-র একক উদ্যোগে ধর্মঘট হয়েছে। বৈঁচিতে যৌথভাবে বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধ হয়েছে। নালিকুলে একক উদ্যোগে মিছিল ও অবরোধ হয়েছে। শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ায় একক উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। ঝাড়গ্রাম শহরে মিছিল হয়েছে সর্বত্র ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। বিনপুরে পিকেটিংয়ের পর সব বন্ধ হয়ে যায়। এখানে বাস পুরোপুরি বন্ধ ছিল। মেদিনীপুর শহরে বাস পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ ছিল। ব্যাংকও বন্ধ ছিল। সর্বত্র মিছিল হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণা হাবরাতে রাস্তা অবরোধ হয়। বনগাঁ শহর ও বারাসাতে পিকেটিং চলে। বসিরহাটে সমস্ত অফিস বন্ধ ছিল। কাঁকিনাড়া ও শ্যামনগর জুট মিল আংশিক বন্ধ ছিল। প্রায় সমস্ত

পাঁচের পাতায় দেখুন

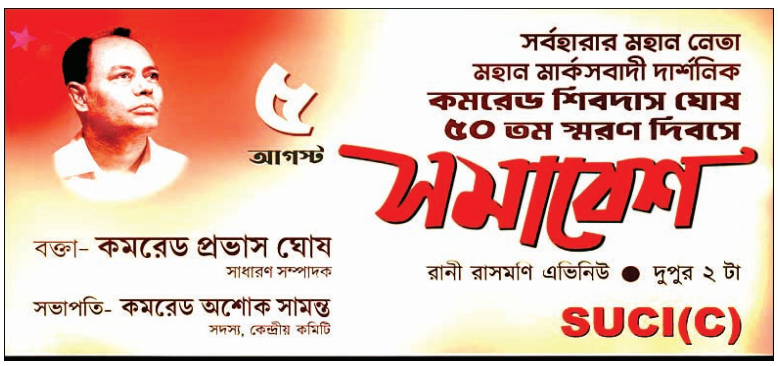

হাওড়ার আন্দুলে সেভ এডুকেশন কমিটির আলোচনা সভা

৫ জুলাই হাওড়ার আন্দুলের ঝোড়হাট ফকির চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বনাশা জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতি, হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষকের ছাঁটাই এবং জেলায় ২৬৮টি সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিরোধে আলোচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন ঝোড়হাট ফকির চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শেখ হায়দার আলি। এই সভায় এলাকার বহু শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী মানুষ এবং ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সেভ এডুকেশন কমিটির হাওড়া জেলা সভাপতি অধ্যাপক বি আর প্রধান এবং জেলা সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক চণ্ডীচরণ মাইতি। গোবিন্দ ঘোষালকে সভাপতি, শুভদীপ মাইতিকে সম্পাদক এবং রামকৃষ্ণ জানাকে কোষাধ্যক্ষ করে সেভ এডুকেশন কমিটি, আন্দুল মৌড়ী শাখা গঠিত হয়।

বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন

একের পাতার পর

ফোন কেড়ে নিয়ে কোনও বিচার ছাড়া বলপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়াই কি এখন বিজেপি রাজত্বের আইন? বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলি সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে এই বেআইনি কাজটিই করে চলছে।

কেন শুধু বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই এমন গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটছে? স্রেফ ভোটের জন্য। যাদের বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে ধর্ম পরিচয়ে তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ আর্থিক ভাবে অনুন্নত। দশকের পর দশক ধরে কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে তাঁদের যাতায়াত। ঠিক যেমন দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও এ রাজ্যে মানুষ আসেন রুজির সন্ধানে। গত বেশ কিছু দিন ধরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তাঁদের উপর পুলিশ প্রশাসনের হামলা ক্রমাগত বাড়ছে। বাংলাদেশি রটনা বহুক্ষেত্রে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের এঁদের উপর আক্রমণে প্ররোচিত করছে। ফলে তাঁরা খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। একটি সরকার বা দল ভোটের স্বার্থে কতটা হীন কাজ করতে পারে এ ঘটনা তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

যদি কেউ অবৈধ অভিবাসী বলে প্রমাণিত হন তবে তাঁকে ফেরত পাঠানোর কিছু নিয়ম আছে। প্রথমে তাঁকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। বিদেশি আইনের ১৪ নং ধারা অনুযায়ী মামলা হবে। মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে সাজা হবে। সাজার মেয়াদ শেষে আদালতের মাধ্যমেই যে ব্যক্তি যে দেশ থেকে এসেছেন সেখানকার সরকারের সাথে কথা বলে ফেরত পাঠানো হবে।

প্রশ্ন উঠছে বিজেশি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাদেশি বলে যাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, তা কোন নিয়মে করা হচ্ছে? কোন আইনে তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে অথবা দেশের বাইরে বের করা হচ্ছে? ১১ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, এই আটক কোর্টের নির্দেশে কি? কেন আটক? আটকের কারণ ওই শ্রমিকদের পরিবারকে জানানো হয়েছিল কি না, কে এ ব্যাপারে তদন্ত করেছিল? এ ব্যাপারে দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান হয়েছিল কি না? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিজেপি সরকারের পুলিশ আইনের কোনও তোয়াক্কা করছে না।

দিল্লির বসন্তকুঞ্জের বাংলাভাষী জয়হিন্দ কলোনিতে দীর্ঘ দিন বসবাসকারী দরিদ্র নাগরিকদের দিল্লি মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন যে ভাবে জল এবং বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়ে বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তা শুধু চরম অমানবিকই নয়, সম্পূর্ণ বেআইনি।

বিজেপি নেতারা তোতাপাখির মতো অনুপ্রবেশের তত্ত্ব আওড়ে চলেছেন। বলছেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীতে নাকি দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি বিজেপি নেতারা এটাকে সত্যি বলে মনে করেন? তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তের একটা বিরাট অংশ খোলা রেখে দিয়েছে কেন? দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের অধীন বিএসএফ-এর নজরদারি এড়িয়ে তা ঘটতে পারছে কী করে? কেন সরকার বিএসএফের কাছে এর জন্য

বিজেপি নেতারা বলছেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীতে নাকি দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তের একটা বিরাট অংশ খোলা রেখে দিয়েছে কেন? কেন্দ্রের অধীন বিএসএফ-এর নজরদারি এড়িয়ে তা ঘটতেই বা পারছে কী করে?

জবাবদিহি চাইছে না? কম-বেশি অনুপ্রবেশ গোটা বিশ্বের সমস্যা। যুদ্ধ, বন্যা, ভাঙন, উচ্ছেদ, বেকারত্ব ইত্যাদি নানা কারণে অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনীতির দেশে অনুপ্রবেশ দীর্ঘ দিন ধরেই চলছে। গুজরাট থেকেও বহু সংখ্যক মানুষ যে এমনকি আমেরিকায় বেআইনি অনুপ্রবেশ করেছিলেন সম্প্রতি আমেরিকা তাঁদের হাত-পা বেঁধে ফেরত পাঠানোয় আজ তো আর কারও অজানা নয়।

বিজেপি শাসিক রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের উপর বাংলাদেশি বলে হেনস্থার ঘটনা অনেক দিন ধরেই ঘটছে। দায়িত্বশীল হলে এর বিরুদ্ধে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের তো অনেক আগেই তৎপর হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তা তারা হয়নি। এখন যখন সমস্যা গুরুতর আকার নিয়েছে এবং বিধানসভা নির্বাচনও কাছাকাছি এসে গেছে, তখন হঠাৎ-ই তাদের তৎপরতা চোখে পড়ছে। তারা এত দিন তৎপর হয়নি কেন? কেন রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের কাছে এর তীব্র প্রতিবাদ করেনি? এখন হঠাৎ তারা নিজেদের ত্রাতা হিসাবে তুলে ধরতে তৎপর হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এই নীরব থাকা এবং তৎপর হওয়ার পিছনেও কাজ করছে প্রাদেশিক সেন্টিমেন্ট তুলে ভোট-ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ। কিন্তু ভোট রাজনীতির ময়দানে যুযুধান দুই পক্ষের মাঝখানে পড়ে আছেন যাঁরা, সেই দিশেহারা রাজ্যের হাজার হাজার গরিব মানুষ, দিন গুজরান করতে প্রতিনিয়ত কাজ খুঁজতে পরিবার-পরিজনকে ছেড়ে ভিন রাজ্যে যেতেই হয় যাঁদের, তাঁরা কী ভয়ঙ্কর আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তা কি অনুভব করতে পারেন ভোটের হিসাব কষা রাজ্যের এই সব নেতা-মন্ত্রীরা, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা? পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারাও তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুকরণে অনুপ্রবেশের বুলি কলের পুতুলের মতো আউড়ে যাচ্ছেন। এ রাজ্যের গরিব পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণা, বাংলাভাষী রাজ্যবাসীদের অপমান তাঁদের গায়েই লাগছে না। বাস্তবে এই অনুপ্রবেশ তত্ত্ব মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারলেই যেন তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরিত হয়। এঁরাও কি কোনও ভাবে এ রাজ্যের মানুষের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য?

সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাঁদের মধ্যে অন্য ধর্মের মানুষের সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি ও তা জিইয়ে রেখে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা বিজেপি রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ। অনুপ্রবেশ তাদের পুরনো ইস্যু। বাস্তবে জনগণের সামনে তুলে ধরার মতো কোনও সাফল্যই বিজেপি শাসনে ঘটেনি। বরং জনজীবনের সমস্যাগুলি বিজেপি শাসনে গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তাই দেশজুড়ে জনমানসে বিজেপি বিরোধী মানসিকতা দেখে ভীত বিজেপি নেতৃত্ব। তাই অনুপ্রবেশের জুজুই এখন তাদের একমাত্র হাতিয়ার। বিজেপির যুক্তি ধারাটা হল— দেশে চাকরি নেই কেন? দায়ী অনুপ্রবেশ। দেশের মানুষের খাদ্য নেই কেন? কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ কী? বাইরে থেকে আসা মুসলমানরা দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। চাকরি বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে আর হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে না। বাস্তবে তাদের এই সব মনগড়া তত্ত্বের সাথে এমনকি সরকারি তথ্য পরিসংখ্যানেরও কোনও মিল নেই। ২০১১-র জনগণনায় বিজেপি-কথিত লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীর কোনও তথ্য মেলেনি। গোটা দেশে মুসলিম জনসংখ্যার হার বেড়েছে এমন কোনও পরিসংখ্যা কোনও সমীক্ষাইে মেলেনি। ২০২১-এর জনগণনা তারা ঝুলিয়ে রাখল কি তাদের মনগড়া অভিযোগ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে?

দারিদ্র-বেকারি-অপুষ্টি-শিশুমৃত্যু-অশিক্ষা, শিক্ষা-চিকিসার সংকট ইত্যাদির প্রকৃত কারণ যে এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী শোষণ এবং পুঁজিবাদের সেবাদাস হিসাবে প্রথমে কংগ্রেস, বর্তমানে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি তা তারা দেশের মানুষের থেকে আড়াল করতে চায়। কিন্তু দেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে তাঁদের জীবন-যন্ত্রণা থেকে সত্যিকারের রেহাইয়ের প্রয়োজনেই এই ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া চলবে না। এই সব মিথ্যা প্রচারের ঢক্কানিনাদ থেকে বেরিয়ে চোখ খোলা রেখে, যুক্তি-বিজ্ঞানের আলোয় সত্যের পথ খুঁজে নিতে হবে জনসাধারণকেই। সত্যচর্চার মধ্যেই নিহিত আছে মিথ্যার কারবারিদের মুখোশ খুলে দেওয়ার দায়িত্ব পালন। একই সঙ্গে রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষকে তৃণমূল-বিজেপির এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। মাথা উঁচু করে মর্যাদার সঙ্গে দেশের যে কোনও রাজ্যে বসবাসের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখতে সংঘবদ্ধ ভাবে রাজ্যে তৃণমূল সরকার এবং কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের উপর চাপ তৈরি করতে হবে।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি)-র গড়িয়া লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য, শিক্ষক সংগঠন এসটিইএ-র কলকাতা জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক কমরেড মাধব বর্মন গত ৯ জুন স্কুলে পড়ানোর সময় ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। দশ দিন কোমায় থাকার পর ১৯ জুন তাঁর জীবনাবসান হয়। বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

বাল্যাবস্থায় পিতৃহীন মাধব বর্মন জেলার কামাখ্যাগুড়িতে অভাব দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে শিক্ষাজীবন শেষ করে কলেজে তিনি ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন। পরে রাইটার্স বিল্ডিং-এ চাকরি সূত্রে কলকাতায় আসেন। চাকরি জীবনের প্রথম থেকেই তিনি প্রতিবাদী সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারির ঐতিহাসিক সরকারি কর্মচারী ধর্মঘটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। পদোন্নতির ব্যাপক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও 'আগামী দিনের মানুষ গড়ার' স্বপ্ন নিয়ে সরকারি চাকরি ত্যাগ করে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং আমৃত্যু শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সাম্প্রতিক ডিএ আন্দোলন এবং যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি রক্ষার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

তাঁর কাছাকাছি যাঁরা এসেছেন প্রত্যেকেই তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সংবেদনশীল মনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভালবাসা ও দায়বদ্ধতার জন্য তিনি একজন জনপ্রিয় শিক্ষকে পরিণত হয়েছিলেন।

সদালাপী, বিনয়ী মাধব বর্মন বসবাসের এলাকায় রাস্তা, নিকাশি ইত্যাদির উন্নয়ন নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯ জুন গভীর রাতে তাঁর মরদেহ ক্লাব প্রাঙ্গণে আনা হলে এলাকাবাসী, ক্লাব সদস্যরা এবং দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ীর পক্ষে অনিন্দ্য রায়চৌধুরী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সন্দীপন মহাপাত্র, লোকাল সম্পাদক কমরেড শ্রীধর নন্দী সহ উপস্থিত কমরেডরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

গড়িয়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে ১৩ জুলাই বোয়ালিয়া এফ পি স্কুলে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনিন্দ্য রায়চৌধুরী।

কমরেড মাধব বর্মন লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (সি)-র বড় হওয়ার পদ্ধতি অন্যদের থেকে আলাদা

শিবদাস ঘোষ

"আমাদের দলের বড় হওয়ার পদ্ধতির সাথে অন্যান্য দলের বড় হওয়ার পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। তারা সংগঠন বাড়াচ্ছে শাসক দলের সুবিধা নিয়ে। সব সংসদীয় দলই এটা করে। শাসন ক্ষমতায় থাকবার সুযোগ নিয়ে, তার সুবিধা নিয়ে তারা দলবল বাড়ায়।

আমরা এ ভাবে ভাবি না। আমাদের বড় হবার নীতিটা আমরা অন্য ভাবে ভাবছি। আমরাও বড় হতে চাই, বড় হচ্ছি, কিন্তু অন্য পদ্ধতিতে। শ্রমিক-চাষিদের কমিটিগুলো গঠন করে গণসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রামের পথে কর্মী তৈরি করতে এবং সাধারণ কর্মীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব তৈরি করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। গণসংগঠনগুলোর মধ্য থেকে, কৃষক-শ্রমিকদের মধ্য থেকে কর্মী তৈরি করে, আমরা নেতৃত্বে নিয়ে আসবার চেষ্টা করি।

চেষ্টা করি যাতে চাষির ঘর থেকে, শ্রমিকের ঘর থেকে কর্মী তৈরি করা যায়, নেতৃত্ব তৈরি করা যায়। ...

এই পরিস্থিতিতে আদর্শগত সংগ্রামের হাতিয়ারকে ব্যবহার করে আলোচনার মধ্য দিয়ে খুব গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে একত্রিত করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, বিপ্লবই আসলে বিকল্প। কিন্তু বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী পার্টি চাই। আর কার কত শক্তি, তাই দিয়ে বিপ্লবী পার্টি বিচার করতে যাবেন না। কারণ, অবিপ্লবী পার্টিরও শক্তিবৃদ্ধি হয়। না হলে মুসলিম লিগের শক্তিবৃদ্ধি হত না, জনসংঘের শক্তিবৃদ্ধি হত না, সভ্যতার চরম শত্রু হয়েও হিটলারের পার্টি গোটা জার্মানিকে তার পেছনে জড়ো করতে পারত না। শুধু মালিকদের সমর্থনে এটা হয় না। কারণ দেশে মালিকরা আর ক'জন? জনসাধারণ সমর্থন না করলে তাদের শক্তি টেকে কী করে, বাড়ে কী করে? জনগণ বহু কারণেই তাদের সমর্থন করতে পারে ও করে, যদি না সত্যিকারের বিপ্লবী চেতনা তাদের মধ্যে দেওয়া যায়। তাই আপনাদের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বুঝতে হবে, বিপ্লবী পার্টি বুঝতে হবে, বুঝতে হবে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ হল একমাত্র হাতিয়ার।

এই বিজ্ঞানটা আয়ত্ত করতে পারলে, তার প্রয়োগ কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনারা জনগণকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক বোঝাতে পারবেন। আপনারা বোঝাতে পারবেন যে, মার্ক্সবাদের নামে বাকি পার্টিগুলো শুধুমাত্র শব্দগত পার্থক্য ছাড়া একই কথা বলে কী ভাবে জনগণকে ঠকাচ্ছে। এ জিনিস বুঝিয়ে এইসব দলের প্রভাব থেকে জনগণকে তখনই আপনারা মুক্ত করতে পারবেন, যখন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ যথার্থভাবে আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন।

তা ছাড়া আমাদের দল সঠিক কি না, সঠিক হলে কী ভাবে সঠিক এবং বিপ্লবকে আমরা কী ভাবে দেখছি এবং কী ভাবে তা করতে হবে, সেটা বুঝতে পারবেন এবং সেইভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।"

'নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় ভারতের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব'

পঞ্চম খণ্ড, শিবদাস ঘোষ রচনাবলি

বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা

একের পাতার পর

তো বিপ্লবী। বাস্তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ভূমিকা যথাযথ জানলে কেউ বিপ্লবীদের সম্পর্কে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যাঁরা এ কাজ করলেন তাঁরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানোর যোগ্য? কী শেখাবেন তাঁরা ছাত্রদের? একবার এই বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

বাস্তবিক বিপ্লবীদের সম্পর্কে সন্ত্রাসবাদী উচ্চারণ শুধু বিপ্লবী এবং শহিদদেরই অসম্মান নয়, অসম্মান বিদ্যাসাগরেরও। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার আবেদন নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিলেন একদল। বিদ্যাসাগর তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাঁরা প্রয়োজন হলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে পারবেন কি না। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা তাড়াতাড়ি ঘরের জানালা বন্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। সেই বিদ্যাসাগরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের বিদ্যার দৌড় কতদূর সেই সন্দেহ তো জাগবেই। বিদ্যাসাগর মশাইও তো এঁদের চোখে সন্ত্রাসবাদী হয়ে যাবেন! বিদ্যাসাগর এ দেশের বুক থেকে 'সাতপুরু মাটি উপড়ে ফেলে, পুরাতন প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষের চাষ বন্ধ করে নতুন মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল ফলেছিল মেদিনীপুর সহ সারা বাংলা জুড়ে। ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান সুপ্ত জাতির ঘুম ভাঙিয়েছিল এই পথেই। জেমস পেডি, যিনি লবণ সত্যাগ্রহীদের ওপর, মহিলাদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে বীভৎস অত্যাচার চালাচ্ছিলেন, সেই সন্ত্রাসবাদী খুনি ব্রিটিশ জেলাশাসককে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল তাঁর অত্যাচারের সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন বীর বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত। সঙ্গী ছিলেন জ্যোতিজীবন ঘোষ। দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র বিমল দাশগুপ্ত পরে অত্যাচারী ভিলিয়ার্সকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। নৃশংস অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত করে মৃত ভেবে ফেলে দিয়েছিল লালবাজারের পুলিশ। বাবা অক্ষয় দাশগুপ্ত ক্ষতবিক্ষত সন্তানকে চিনতে পারেননি। স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মহান এই বিপ্লবীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাবে মৃত্যুদণ্ড দিতে না পেরে বিমল দাশগুপ্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়েও মাথা নত করেননি। আমৃত্যু ছিলেন আপসহীন যোদ্ধা। নেতাজির কাঙ্ক্ষিত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তিনি ছিলেন অবিচল। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের সামনে ছাত্রদের টিফিন বিক্রি করে দিন চালাতেন।

পেডি'র পর এসেছিলেন আর এক অত্যাচারী জেলাশাসক ডগলাস। যিনি জেলা জুড়ে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিতে শুরু করেন, যা নৃশংস রূপ নিয়েছিল ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর খড়্গপুরের হিজলি জেলে। তারই নির্দেশে রাতের অন্ধকারে বন্দিদের উপর চলেছিল বীভৎস গুলিবর্ষণ। বিপ্লবী সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বহু বিপ্লবী রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। প্রতিবাদে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে গর্জে উঠেছিল বাংলা। বিশাল এক সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন তার বিখ্যাত কবিতা 'প্রশ্ন'। যেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো'!

১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল জেলা বোর্ডের মিটিং চলাকালীন বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও তাঁর সঙ্গী প্রভাংশু পালের রিভলবার গর্জে উঠেছিল। খতম হয়েছিলেন খুনি জেলাশাসক ডগলাস। প্রদ্যোৎ মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এরপর জেলাশাসক বার্জ এসে শুরু করেন ছাত্র যুবকদের উপর বীভৎস অত্যাচার। মেদিনীপুরে সাইকেল চালানোও নিষিদ্ধ হয়। ছাত্রদের সাদা, হলুদ ও লালকার্ড দেওয়া হয়, যা তাদের সব সময় পকেটে রাখতে হত। লাল কার্ড মানে গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী সে বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত। চলত দমন-পীড়ন। চালু করেছিলেন 'পিটুনি কর'। এমন অত্যাচারীকেও বিদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিপ্লবীরা। বার্জ ভয়ে প্রকাশ্যে বেরোতেন না। ১৯৩২ সালের ২ সেপ্টেম্বর কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে পুলিশ লাইনের মাঠে ফুটবল ম্যাচের উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন বার্জ। টাউন স্কুলের ছাত্র অনাথবন্ধু পাঁজা, মৃগেন দত্ত ও রামকৃষ্ণ রায় মাঠের মধ্যেই রিভলবার উঁচিয়ে গুলি করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন বার্জের উপর। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন অনাথবন্ধু ও মৃগেন। ফাঁসিতে জীবন উৎসর্গ করেন রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও নির্মলজীবন ঘোষ। সনাতন রায় সহ একদল ছাত্রের হল যাবজ্জীবন জেল, আন্দামানে দ্বীপান্তর। যারা সাগর পার হয়ে ইংল্যান্ড থেকে এসে এ দেশের উপর দুশো বছর ধরে শোষণ লুণ্ঠন নিপীড়ন অত্যাচার চালিয়ে গেল তার বিরোধিতার নাম হল সন্ত্রাসবাদ! স্বাধীনতার ৮০ বছর পরেও এমন কথা বলা কি নিছকই একটা ভুল? নাকি, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাদের দুশো বছরের শাসনের মধ্য দিয়ে এক অংশের ভারতবাসীর মধ্যে যে দাসত্বের মনোভাব গড়ে তুলেছিল, এই প্রশ্নপত্র রচয়িতা ও নির্বাচকবৃন্দের মধ্যে দেখা গেল সেই মনোভাবেরই প্রকাশ?

স্বাধীনতার মত ও পথ নিয়ে পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য যখন দেশের স্বাধীনতা, তখন সেই সংগ্রামে অংশ নেওয়া সকলেই তো স্বাধীনতা সংগ্রামী। কারও পথ অহিংস, কারও সশস্ত্র। 'সন্ত্রাসবাদী' এই অভিধা অত্যাচারী ব্রিটিশের দেওয়া! যারা ভারতকে শাসন করতে অত্যাচারের কোনও পন্থাই বাকি রাখেনি, তারা যে তার প্রতিকারের লক্ষ্যে যারা লড়াই করছে, তাদের সন্ত্রাসবাদী বলবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতের কোনও মানুষ যদি ব্রিটিশদের মতোই বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যায় ভূষিত করে তবে ভারতবাসী হিসাবে তার থেকে লজ্জার আর কিছু থাকে কি! সে দিন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, নেতাজি প্রমুখ মহান মানুষেরা কেউই আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলেননি। যদিও পরাধীন ভারতে এক দলের মধ্যে এমন মানসিকতার অভাব ছিল না। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও কি সেই একই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেব আমরা? এই মনোভাব তো গোলামির!

আপসহীন বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে তুলে ধরে ছাত্র-যুবদের মনে তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরিই কি এর উদ্দেশ্য নয়? স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারা সম্পর্কে এমন ভীতি তো ছিল ব্রিটিশ শাসকের। আজকের দিনে সেই ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির মনে। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ কেন তার শিকার হবে? এই মানসিকতা আজকের দিনে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে দুর্বল করবে। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র পরাধীন ভারতে বহু মানুষের মধ্যে এমন মানসিকতা লক্ষ করেই বলেছিলেন, শাসক আর শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যদি এক হয়ে যায় তবে তার থেকে দুর্দিন বুঝি দেশের আর কিছু হতে পারে না।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, অসীম সাহসে তার প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে যেতে ছাত্রদের তো শিক্ষকদের থেকেই শেখার কথা। সমস্ত বড় মানুষদের পিছনেই এমন শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া অসংখ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা যাতে মাথা উঁচু করে সাহসের সাথে প্রতিবাদীর ভূমিকা পালন করতে পারে, শোষণহীন নতুন সমাজ গড়ার পথে এগিয়ে যেতে পারে, শিক্ষকরা সেই শিক্ষাই দিন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের চশমা চোখে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবমূল্যায়ন করবেন না। না হলে ইতিহাসে আপনারাও অপরাধী হয়ে থাকবেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কনভেনশন

৬ জুলাই নোনাকুড়ির নজরুল মঞ্চে শহিদ মাতঙ্গিনী কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক শঙ্কর মালাকার, জেলা সহ সভাপতি প্রদীপ দাস, কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটির সম্পাদক প্রবীর প্রধান। সভাপতিত্ব করেন কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটির সভাপতি রতন চন্দ্র মাইতি।

প্রিপেইড স্মার্ট মিটার গ্রাহকদের কীভাবে লুট করছে, তা তুলে ধরেন বক্তারা। সোমনাথ ভৌমিককে সভাপতি, অশোক পাত্রকে সম্পাদক করে ৩২ জনের শহিদ মাতঙ্গিনী কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটি গঠিত হয়।

সুশ্রুতনগরে কমসোমলের ফুটবল টুর্নামেন্ট

দার্জিলিং জেলার সুশ্রুতনগরে কমসোমলের উদ্যোগে শিশু কিশোরদের যে ব্রিগেডগুলি পরিচালিত হয়, তাদের উদ্যোগে ৫ জুলাই শহিদ শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের স্মরণ দিবসে বিধানপল্লি মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। বরুণ বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু হয়। টুর্নামেন্টে মোট ৪টি টিম (জুনিয়র-ইলেভেন, ফিয়ারলেস নাইন স্টারস, কাওয়াখালি বয়েজ, কাওয়াখালি জুনিয়র স্টারস) অংশগ্রহণ করে।

বিজয়ী হয় কাওয়াখালি বয়েজ টিমের খেলোয়াড়দের মেডেল এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কমসোমলের জেলা ইনচার্জ কমরেড সৌরভ মহন্ত, এআইডিএসও দার্জিলিং জেলার নেতৃবৃন্দ ও এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা।

বিধাননগরে শিক্ষা কনভেনশন

বিধাননগর সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে ৬ জুলাই আইপিএইচই হলে একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও বহু শিক্ষানুরাগী বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের

প্রতিনিধিরা স্কুলশিক্ষা কী ভাবে দিনের পর দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে সে সম্পর্কে নানা মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। সকলেই এর প্রতিবাদে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন এই মত ব্যক্ত করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডঃ মৃদুল দাস।

তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন জাতীয় শিক্ষানীতিতে কীভাবে ভালো ভালো কথার আড়ালে শিক্ষার পুরোপুরি বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণের চক্রান্ত করা হয়েছে। সবশেষে সভাপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রভাত দত্ত সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিপ্লবীদের ‘সন্ত্রাসবাদী’ আখ্যা
এআইডিএসও-র প্রতিবাদ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠ সেমিস্টারের ইতিহাস প্রশ্নে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা শহরে বিক্ষোভ দেখাল এআইডিএসও। সংগঠনের অভিযোগ, ব্রিটিশ পুলিশ যে ভাবে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে বিপদ হিসাবে দেখত, স্বাধীন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ও সেইভাবে দেখাবে, এটা দুর্ভাগ্যজনক। অষ্টম শ্রেণির স্কুলপাঠ্যে এইভাবে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারও পুনর্লিখনের নামে ইতিহাস বিকৃত করার নানা চেষ্টা করেছে। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কমরেড সায়ন্তন ওঝা ও অন্যরা।

শহিদ মোকাররম খাঁ স্মরণে সভা

১০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মেরিগঞ্জ-১ এর পূর্ব খালপাড় স্কুল মাঠে অমর শহিদ কমরেড মোকাররম খাঁর ৪২তম স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট জননেতা ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। বক্তা ছিলেন কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাজকুমার বসাক। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বাদল সরদার

পূর্ব মেদিনীপুর ডিআই দপ্তর অভিযান এআইডিএসও-র

যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফেরানো, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সকল শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, রাজ্যের ৮০২৭টি সরকারি স্কুল বন্ধের ষড়যন্ত্র বাতিল, একাদশ-দ্বাদশে সেমিস্টার প্রথা বাতিল, স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল, জেলার স্কুলগুলোতে এবং মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর উন্নতি, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ সরকারি শিক্ষা বাঁচানোর নানা দাবিতে ৩ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের ডিআই দফতর অভিযান করে এআইডিএসও।

দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর প্রতিবাদী মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তনুশ্রী বেজ, রাজ্য কমিটির সদস্য সুদর্শন মান্না, পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদিকা নিরুপমা বক্সি, জেলা সভাপতি শুভজিৎ অধিকারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের দাবিতে বানভাসিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ

বন্যাত্রাণের চিড়া-গুড়-ত্রিপলের ভিক্ষা নয়, শিলাবতী নদীর নিম্নাংশ সংস্কারের মধ্য দিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু করতে হবে—

এই দাবিতে ঘাটালে বানভাসিরা বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ করেন।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে আরামবাগের এক প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘাটালের সাংসদকে সামনে রেখে মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই ঘোষণার পর প্রায় ১৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও পাঁচটি স্লুইসগেট পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করা ছাড়া বাস্তবে মাস্টার প্ল্যানের কোনও কাজই শুরু হয়নি।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি বলেন, বহু প্রতীক্ষিত এই মেগা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও অর্থ বরাদ্দ না করায়, রাজ্যই মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করবে— মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে আমরা সাধুবাদ জানিয়েছিলাম। এখন দেখছি জনগণকে প্রতারণায় কেন্দ্র-রাজ্য যমজ ভাই।

৭ জুলাই ঘাটালের তিন শতাধিক বানভাসি মানুষ এক বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন ও কলেজ মোড়ে পথ অবরোধ করেন। নেতৃত্ব দেন কমিটির সভাপতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা, কার্যকরী সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, দেবাশীষ মাইতি ও অফিস সম্পাদক কানাই লাল পাখিরা, কোষাধ্যক্ষ নাড়ুগোপাল দোলুই প্রমুখ।

মর্যাদা সহকারে পালিত হল সাঁওতাল বিদ্রোহ ‘হুল’ দিবস

৩০ জুন হুল বিদ্রোহ শুরুর দিনটি থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ‘অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি (এআইজেএএসসি), ফেডারেশন অব আদিবাসী অর্গানাইজেশনস সহ অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বিপুল উদ্দীপনার সাথে সাঁওতাল বিদ্রোহ ‘হুল’ দিবস পালিত হয়। কলকাতার বুকে সিদো-কানহু ডহরে সিদো কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির সহযোগিতায় ৭ জুলাই ‘হুল’ দিবসের অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি রাজ্যপালকে দেওয়া হয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া প্রভৃতি জেলায় ছোট-বড় সভা, আলোচনা সভা, ওয়েবিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিনটিকে উদযাপন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা হুল দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ১৮৫৫ সালের ৩০ জুনের সমাবেশ ছিল অত্যাচারীর শোষণ এবং শাসন থেকে মুক্তির আহ্বান। কিন্তু সরকার এবং তাদের তল্পিবাহক কিছু সংগঠন নাচ-গান সহ বিভিন্ন ধরনের সস্তা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করে এই গৌরবময় দিনটিকে উৎসবের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে আদিবাসী, জনজাতি সহ গরিব সাধারণ মানুষের মূল সমস্যাগুলিকে আড়াল করে চলেছে। বক্তারা এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সভাগুলি থেকে দাবি উঠেছে আদিবাসী বিদ্রোহগুলির যথার্থ মূল্যায়ন করে তা ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে সব স্তরের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়ে অবগত হতে পারে। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট-২০০৬-কে দুর্বল করে বন সংরক্ষণ রুল ২০২২ এবং বন সংরক্ষণ সংশোধনী আইন ২০২৩ প্রয়োগ করে জল, জমি এবং জঙ্গলের অধিকার থেকে আদিবাসী তথা বনবাসী মানুষকে উচ্ছেদ করে তা কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে। এর ফলে নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে। সভা থেকে আওয়াজ ওঠে এসপিটি এবং সিএনটি অ্যাক্ট সংশোধন করা চলবে না, বীরভূমের দেউচা পাঁচামি, পুরুলিয়া মেলার অযোধ্যাতে টুড়গা প্রকল্প রূপায়ণ করে আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী ও গরিব মানুষকে জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।

কোনও অজুহাতেই আদিবাসী ও গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করা যাবে না, জঙ্গল এবং জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের জঙ্গলের জমির পাট্টা দিতে হবে।

ধর্মঘটের সমর্থনে সর্বত্র পথে নামলেন শ্রমজীবীরা

- *ধর্মঘট সমর্থনে অবস্থান বিক্ষোভ। জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ (ওপরে)*
- *মধ্যপ্রদেশে ধর্মঘটী শ্রমিকদের অবস্থান বিক্ষোভ (বাঁ দিকে)*

একের পাতার পর

জুট মিলে পিকেটিং হয়েছে। ব্যারাকপুর জুটমিল আংশিক বন্ধ ছিল। আগরপাড়া জুট মিলে টিএমসি ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর হামলা চালায়। ডায়মন্ডহারবার, রায়দিঘি, বিজয়গঞ্জে মিছিল হয়েছে। বজবজ বিড়লা জুটমিলে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট করেছেন। অন্যান্য জুট মিল আংশিক বন্ধ ছিল।

পূর্ব মেদিনীপুর ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের মেচগ্রামে এবং ১১৬-বি জাতীয় সড়কের মেছেদায় অবরোধ করেন ধর্মঘটীরা। সকালে হলদিয়া-পাঁশকুড়া রেলওয়ের রানিচকে রেল অবরোধ করলে পুলিশ ৬ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে। মেছেদা বাসস্ট্যান্ড ও পাঁচমাথার মোড়-তমলুক-নিমতৌড়ি-চণ্ডীপুর-ময়না-এগরা দিঘা মোড় ও ত্রিকোণ পার্ক প্রভৃতি স্থানে পথ অবরোধ হয়। কোলাঘাট, পাঁশকুড়া স্টেশন বাজার, নোনাকুড়ি, এগরা, কাঁথি, পটাশপুর, বাজকুল, ভগবানপুর প্রভৃতি স্থানে পিকেটিং করে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান ধর্মঘটীরা। পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণে স্কোয়াড পিকেটিং হয়েছে কাঁথি, এগরা, বাজকুল, ভগবানপুর, মুগবেড়িয়া, পটাশপুর, মারিশদা, খেজুরিতে। ব্যাঙ্ক ও অফিসে পিকেটিং হয় কাঁথি ও এগরা শহরে। বাঁকুড়ার খাতড়া বন্ধহয়েছে, বাঁকুড়ায় যানবাহন চলেনি। চারটি ব্যাঙ্ক বন্ধছিল। মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত এআইইউটিইউসির কর্মী সমর্থকদের মিছিল হয়। শহরের অধিকাংশ ব্যাঙ্কে পিকেটিং করা হয় এবং রথবাড়িতে সভায় এআইইউটিইউসি জেলা সম্পাদক কমরেড অংশুধর মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। দক্ষিণ দিনাজপুর সকাল ১০টায় বন্ধের সমর্থনে ৫০ জনের বেশি কর্মীর এক মিছিল শহর পরিক্রমা হয়। বীরভূম জেলায় মিছিল, পিকেটিং এবং অবরোধ হয়েছে। পিকেটিং এবং অবরোধের সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানে দুটি কোলিয়ারি সম্পূর্ণ এবং কয়েকটি আংশিক বন্ধ ছিল। দুর্গাপুর স্টিলে বনধের প্রভাব পড়েছে। বাস চলেনি বললেই হয়। জেলার বাজার, দোকানপাট বন্ধ হয়েছে। এআইইউটিইউসি একক ভাবে এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যৌথভাবে পিকেটিং করেছে। জেলার একটি জায়গায় রাস্তা অবরোধ হয়। রানাঘাট ও কৃষ্ণনগরে এআইইউটিইউসি-র পিকেটিং হয়েছে। কৃষ্ণনগরে বৃষ্টির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত মিছিল হয়েছে। কর্মীরাও পিকেটিং এ অংশ নিয়েছিল। জেলার একটা জায়গায় আমাদের কর্মীরা অবরোধ করে। রানাঘাট ও কৃষ্ণনগরে এআইইউটিইউসি-র পিকেটিং হয়েছে। কৃষ্ণনগরে বৃষ্টির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত মিছিল হয়েছে।

- *ধর্মঘটে শুনশান শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট (ওপরের বাঁ দিকে)*
- *পশ্চিম মেদিনীপুর প্রশাসনিক ভবনের সামনে ধর্মঘট সমর্থক আশাকর্মীদের বিক্ষোভ (ওপরে)*
- *ধর্মঘটের সমর্থনে ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক দপ্তরে অবস্থানে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মীরা*

সফল সাধারণ ধর্মঘট

এ আই ইউ টি ইউ সি-র অভিনন্দন

১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ৯ জুলাই দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়েছে। এ জন্য সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, ছাত্র-যুব-মহিলা বুদ্ধিজীবীদের অভিনন্দন জানান এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, ফ্যাক্টরি, মিল, খনি, ব্যাঙ্ক, ট্রান্সপোর্ট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ দিন ছিল বন্ধ। জনস্বার্থবিরোধী চারটি শ্রমকোড বাতিল, বেসরকারিকরণ বন্ধ, পুরনো পেনশন স্কিম ফিরিয়ে আনা, এনপিএস এবং ইউপিএস প্রত্যাহার, বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী)-২৩ বাতিল, স্মার্ট মিটার বন্ধ করা, বেকারদের স্থায়ী কাজ, উপযুক্ত বেকার ভাতা, স্কিম ওয়ার্কারদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন প্রভৃতি ১৭ দফা দাবিতে এই ধর্মঘটে সাধারণ মানুষের সরকারবিরোধী পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়েছে।

এই ধর্মঘটে বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি সরকার সহ সব ক্ষমতাসীন সরকারের পুলিশ শ্রমিকদের উপর যে ঘৃণ্য আক্রমণ চালিয়েছে সংগঠন তার তীব্র নিন্দা করছে। ধর্মঘটের সাফল্যকে সংহত করে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান তিনি।

- *পথ অবরোধ। মুরারই, বীরভূম*

পাঠকের মতামত

জীবনস্রোত

একটা বছর পার করেও একজন ডাক্তারি ছাত্রী হিসাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজও দগদগে। এক দিকে মৃত্যুমিছিল, অন্য দিকে মানবিকতার সড়ক বেয়ে স্থানীয় মানুষের উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ছবি আজও মনে পড়ে।

ডাক্তারি ছাত্রী হিসেবে খবরটা কানে আসামাত্রই তড়িঘড়ি স্টেথোস্কোপ, বি পি মেশিন আর কিছু দরকারি সরঞ্জাম কাছে যা ছিল, তা নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যা হিসেবে আমার সাথে পেলাম আরও তিনজন ডাক্তারি ছাত্র, প্যারামেডিকেলের ছাত্রী ও একজন ডাক্তার দিদিকে। ডাঃ নর্মান বেথুনের সেই ডাক তখন কানে বাজছে "ডক্টর্স! গো টু দ্যা উনডেড, ডু নট ওয়েট ফর দেম টু কাম টু ইউ।" রাস্তায় পেলাম কিছু ভলান্টিয়ারকে। ভেজা মাঠের মাঝখান দিয়ে যখন দৌড়চ্ছি তখন রাস্তার দু-পাশে ফুটে থাকা বৃষ্টিস্নাত সাদা টগরগুলোর সৌন্দর্য যেন ভীষণ কড়া নাড়ছিল মনে, বারবার কল্পনায় ভেসে উঠছিল রক্তাক্ত শবদেহের উপর শ্বেত শোকজ্ঞাপন!

অনেকটা পথ হেঁটে, দৌড়ে বিধ্বস্ত বেলাইন কামরাকে ঘিরে বিপুল মানুষের ভিড়ের মাঝে যখন এসে পৌঁছই, তখন একদিকে অবাক হই ও একই সাথে ভীষণ প্রেরণা পাই যে, মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে, কী সুন্দর! তার নিজস্ব সচেতনতায় সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করেনি কোনও রেসকিউ টিমের। তাদের হাতে নেই গজ, ডেটল, কিংবা ব্যান্ডেজ কিন্তু তাদের আছে অফুরান মানবিক হৃদয়। তাই এক হাঁটু কাদাজল, লাউয়ের খেত ডিঙিয়ে তারা ছুটে গেছে ওই 'বাঁচাও বাঁচাও' আর্তনাদের কাছে। পুলিশের ব্যারিকেড তাদের আটকে রাখতে পারেনি। ইদের সকালে জীবপ্রেমে বিশ্বাস রেখেছে তারা, মদত দেয়নি শাসক প্রণোদিত কোনও ধর্মীয় বিদ্বেষে। কাছে ছিল না অ্যাম্বুলেন্স বা বড় গাড়ি। কিন্তু তারা যে যেভাবে পেরেছে, নিজেদের সাইকেল, মোটরসাইকেলে চাপিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে চেয়েছে সেই অসহায় ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলোকে।

বিগত বছরগুলোতে পড়ে আসা শয়ে শয়ে মেডিকেল শাস্ত্রের চিকিৎসাপ্রণালীর প্রয়োগ কী ভাবে করতে হবে শিখলাম ওই দিদিটির থেকে। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছনো মাত্রই কথা বলা শুরু করলেন আহত যাত্রীদের সাথে, সঙ্গী হলাম আমরাও। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ওই লোহার বাক্স কেটে তখনও বের করে আনার চেষ্টা চলছে অনেককে। হঠাৎ নজরে এল পাশের এসি কামরার ভিতর কিছু মানুষের নড়াচড়া। তাদের কাছে গিয়ে জল এগিয়ে দিতে একজন বললেন, 'তোমরা জল দিয়ে জীবন দিলে।' কথাটার মধ্যে যতটা আশ্বাস ছিল ততটাই লুকিয়ে ছিল আশঙ্কা। কোথায় সরকারি রিলিফ টিম আর কোথায় বা রক্ষাকবচ!

প্রশ্ন করছে মন, প্রাণের মূল্য কি ক্ষতিপূরণের টাকাতেই শেষ হয়ে যায়? যে মর্মান্তিক পরিস্থিতির শিকার হলেন এই শতাধিক মানুষ, তার মূল্য কি শুধুই টাকায় মাপা যায়? নাকি জীবনের মূল্যকে শুধুই টাকার অঙ্কে দেখা হয় বলেই দেশে দু'বছরে ২৩টি রেল দুর্ঘটনা! এই ঘটনাগুলোকে শুধুই কি মুড়ে রাখব নিছক দুর্ঘটনার মোড়কে? রেলের টিকিট কাউন্টারে দেখেছি সেখানে চলছে বেসরকারি সংস্থার মেশিন। রেলের নিজস্ব কর্মী নেই, শূন্যপদগুলোতে দীর্ঘকালীন শূন্যস্থান। কিন্তু প্রত্যেক বারই চালকের দোষ নাকি কন্ট্রোলারের দোষ নাকি সিগন্যালের দোষ— এই করতে করতেই স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় নিরাপত্তার প্রশ্ন। 'শুভ যাত্রা'র প্রতিশ্রুতির আড়ালেই থেকে যায় প্রশ্নটা— দায় আসলে কার?

হাসপাতালে আহতদের দেখতে মুখ্যমন্ত্রী সহ ভিআইপিরা আসছেন বলে রাস্তার বড় বড় খাল, গর্ত ঢাকা হয় পিচ ঢেলে। আর এমন এক দূরপাল্লার, লক্ষাধিক মানুষের ট্রেন যাতায়াতের লাইনে দীর্ঘদিন ধরে সিগনাল বিকল হয়ে পড়ে থাকা সত্ত্বেও কারও ভ্রুক্ষেপ হল না। হবেই বা কী করে, কর্তারা তো আবার যাতায়াত করেন নিজস্ব হেলিকপ্টার বা স্পেশাল প্লেনে। সাধারণ মানুষ কোনও রকমে ঠেলেঠুলে অপ্রতুল লোকাল ট্রেনে ওঠেন। গতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া যাদের সাধ্যের বাইরে, অসহনীয় ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে বসে কোনও রকমে যাতায়াতে বাধ্য হতে হয় যাদের, তাদের জনপথেই তো মৃত্যুমিছিল চলে।

ফিরতে হয় আমাকেও, অ্যাপ্রনে জীবনযন্ত্রণার কালি ও প্রাণের চিহ্ন নিয়ে। ওইটুকু সময় তাদের জন্য সমব্যথী হয়ে কিছু করতে পেরেছি কি না জানি না। কিন্তু অন্তত প্রথম তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পেরে মনে হয়েছিল আমিও বেঁচে আছি একজন মানুষ হিসেবে।

সকাল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যে, মেঘঘেরা আকাশও তখন যেন থ মেরে আছে এই নীরব মৃত্যুমিছিলে। ঘটনার ৩০ ঘণ্টা পেরিয়ে, পরদিন ইমার্জেন্সির সামনে এক শববাহী গাড়ির ভিতর নিথর এক শিশুর দেহ। খোঁজ নিয়ে শুনলাম, ৬ বছরের ওই মেয়েটি আমাদের সাথীদের সামনেই শেষ করেছে তার লড়াই। ও যেন প্রশ্ন ছুঁড়ে গেল— নবজাতকদের জন্য এ কেমন বাসযোগ্য বিশ্বকে রেখে যাচ্ছি আমরা?

আর কত? কেন বারংবার আমরা মরছি দৈনন্দিন যন্ত্রণায়? মূল্যবৃদ্ধি, অভাব অনটন, হিংসা, যুদ্ধ দুর্বিষহ করে তুলেছে, তার ওপর অকস্মাৎ মৃত্যুমিছিল! স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকারও কি এখন এক উচ্চাশা? এ কোন ভাগ্যের পরিহাস? এ কোন রামমন্দিরের অভিশাপ? উত্তর কোথায়? গলগল করে বয়ে যাওয়া রক্তের ধারা বন্ধ করতে নির্দোষ তুলো, ব্যান্ডেজের মতোই আমরা সাধারণ খেটে খাওয়া জীবগুলো আজ মরিয়া! একে ওপরের হাত ধরেই যেন টিকিয়ে রেখেছি এই জীবনস্রোতকে।

পৌষালী পাত্র

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

লোকাল ট্রেন বাড়ুক

শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে প্রচুর সাধারণ মানুষ লোকাল ট্রেনে বহু দূর-দূরান্তে যাতায়াত করেন এবং বহু মানুষ তাঁদের ব্যবসায়িক কাজ করার জন্য এই ট্রেনে মালপত্র আনা-নেওয়া করে। সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এ রাজ্যের ক্ষেত্রে এসি লোকাল ট্রেন চালু করছে শুনে কিছু যাত্রী খুব উৎসাহিত। এসির লোকাল ট্রেনে যাতায়াত খুব আরামদায়ক হবে এবং কষ্ট কম হবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল সাধারণ লোকাল ট্রেনে যে মূল্যের টিকিট কেটে যাতায়াত করতে হত, এসি লোকাল ট্রেনের ক্ষেত্রে তার চারগুণ থেকে পাঁচগুণ বেশি ভাড়া গুনে যাতায়াত করতে হবে এবং মান্থলি টিকিটের দামও এসি লোকাল ট্রেনের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকাল ট্রেনের থেকে কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। ফলে সাধারণ নিত্যযাত্রীরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেলেন বলে মনে হয় না।

সাধারণ ট্রেনের থেকে চার গুণ ভাড়া দিয়ে এই এসি লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করতে হবে। এতে বোঝা গেল, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রেল দপ্তর যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কিছুই ভাবেনি। এসি লোকাল ব্যবস্থা না চালু করে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিলে যাত্রীদের অনেক বেশি সুবিধা হত। তা হলে যাত্রীরা একটু হলেও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারেন।

সুদীপ্ত দে,

কৃষ্ণপুর সমর পল্লী, কলকাতা ৭০০১০২

বেকারত্বের সংজ্ঞাই বদলে দিল বিজেপি সরকার

বেকারের সংখ্যা নিয়ে কারচুপি এর আগে কংগ্রেস আমলেও দেখা গেছে। এ বার আর সংখ্যা নিয়ে কারচুপি নয়, বেকারত্ব পরিমাপের মাপকাঠিটাই বদলে দিল বিজেপি সরকার। সপ্তাহে এক ঘণ্টার কাজ জুটলেও তাকে আর বেকার বলে ধরা হবে না। রোজগেরের তালিকায় তার নাম ঢুকে যাবে! কর্মসংস্থানের আসল চিত্রটা ঢাকতে এমন বেনজির সিদ্ধান্ত বোধহয় বিজেপি নেতাদের উর্বর মস্তিষ্কেই সম্ভব! সরকার চাকরি দিতে পারছে না, কল-কারখানায় ছাঁটাই, কুছ পরোয়া নেই। সপ্তাহে এক ঘণ্টা যে কোনও একটা কাজ করলেই আর সে বেকার নয়। বেকারের সংজ্ঞা বদলাতে সরকার ঢাল করেছে 'কারেন্ট উইকলি স্ট্যাটাস' পদ্ধতিকে।

কলমের খোঁচায় বেকারত্বের সংজ্ঞা বদলে দিলেই বেকারের সংখ্যা কি সত্যিই কমে যায়? বাস্তবটা কী? লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশের হাতে কাজ নেই। সিএমআইই-তথ্য বলছে, গত মার্চ মাসেই শুধু ৪২ লক্ষের কাজ চলে গিয়েছে। এমন ভুরি ভুরি তথ্য সরকারের নিজের হাতেই মজুত। তার জন্যই কি প্রতারণার পথ নিচ্ছে বিজেপি সরকার?

কাগজে-কলমে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং আওয়ার হল, সপ্তাহে ৪০-৪৪ ঘণ্টা কাজ। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং আইএলও-র ২০১৬ রেকর্ড বলছে, ওই সময় থেকেই ১০ জনের মধ্যে একজন কর্মী সপ্তাহে ৫৫-৬০ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করতে বাধ্য হন। এমনকি লম্বা সময় কাজ করতে বাধ্য হয়ে বিশ্বে বছরে ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার মানুষ হার্টের রোগে বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারাও যান। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কাজের অনিশ্চয়তার জন্য ঘণ্টার হিসাব না রেখেই কাজ করতে বাধ্য হন মানুষ। এখন মোদি জমানায় চারটি শ্রমকোড চালু করে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ১২-১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। একদিকে শ্রমসময় বৃদ্ধি, মাইনে ছাঁটাই, অন্য দিকে শ্রমিক ছাঁটাই চলছে নির্বিচারে। এখন আবার বেকার-ছাঁটাই। সপ্তাহে একদিন কোথাও ইলেকট্রিক বালব লাগানোর বা মাটি কাটার কাজ করলেও তাকে রোজগেরে হিসাবে ধরা হবে। চরম ব্যর্থতা ঢাকতে সরকারের এই 'সহজ সমাধান' সাধারণ ঘরের বেকার যুবকদের বিপাকে ঠেলছে। বিপন্ন হচ্ছে গোটা পরিবার।

'এক ঘণ্টা = ফুল জব' মোদিজির এই 'পাকা' বন্দোবস্তে দেশে আর কোনও বেকারই থাকবে না! তিনি অবশ্য বলেননি, 'ফুল জব' ধরা হলে এই একঘণ্টার জন্যই পুরো সপ্তাহের 'ফুল' মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে কি না! কোনও রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টায় যে কোনও মজুরিতে, যেখানেই হোক কাজ করতে বাধ্য হয় বিরাট সংখ্যক মানুষ। আর কায়িক শ্রমজীবী মানুষ সপ্তাহের প্রতিটি দিনই অত্যন্ত কম মজুরিতে হলেও কাজ করতে বাধ্য হন। এখন এই বন্দোবস্তে সরকারের আর কাজ দেওয়ার দায়িত্বই রইল না।

ক্ষমতায় আসার আগে বছরে দু'কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। একটানা ১১ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মোদির 'বিকশিত ভারতে' সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা— বেকারত্ব বাড়ছে লাফিয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ চলে যাচ্ছে। ২০১৯-এ খোদ সরকারি রিপোর্টেই প্রকাশ হয়েছে, দেশে বেকারত্বের হার গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। বেকারের সংখ্যা এত বাড়ছে যে, জুন মাসে গত বছরের তুলনায় ৪.৫ শতাংশ বেশি পরিবার ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজের আবেদন করেছেন। এই অবস্থায় বেকারত্বের সংজ্ঞা বদল কি আপামর দেশবাসীর সাথে প্রতারণা নয়?

জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটা সরকারের দায়িত্ব কী? সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ব হল, প্রতিটি নাগরিকের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার সুষ্ঠু রোজগারের ব্যবস্থা করা। তা কি পালন করছে সরকারগুলি? মানুষের দু'বেলা খেটে খাওয়ার মতো রোজগারের ব্যবস্থাও করতে পারছে না সরকার। এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে সরকারি ব্যর্থতা ঢাকতেই বেকারত্বের সংজ্ঞা বদল। তাতে কি বেকারত্বের জ্বালা এতটুকু দূর হবে? পেট বড় বালাই। অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে দাবি করবে— কাজ দাও, চাকরি দাও, ন্যায্য মজুরি দাও। সংজ্ঞা বদলে বেকারদের আপাতত ধোঁকা দিলেও ক্ষোভের আগুন নেভাতে এর বিরুদ্ধে মানুষ মাথা তুলবেই।

সাধারণ মানুষ ইংরেজি শিখলে অমিত শাহরা ‘লজ্জা’ পান কেন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, যাঁরা ইংরেজি বলেন, কিছুদিন বাদে তাঁরা লজ্জা পাবেন। এ কথা শুনে দেশবাসী অন্তত এটুকু আশ্বস্ত হতে পারতেন যে, লজ্জা-শরম সম্পর্কে কিছু ধারণা তাঁর এখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে! তবে কি না, দেশে গণপিটুনিতে হত্যা, ধর্ষণ, ঘৃণাভাষণের অসংখ্য ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তাঁর নির্বিকার অবস্থান দেখে লজ্জার রেশ পাওয়া কঠিন।

তাঁদের লজ্জা কি শুধু দেশবাসী ইংরেজি শিখলেই! কেন হঠাৎ অমিত শাহদের এমন ভাবনা? কারণ, তাঁরা ভালই জানেন যে, ইংরেজির মাধ্যমে যথার্থ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত সচেতন জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী চেতনা গড়ে ওঠার মধ্যেই রয়েছে তাঁদের মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের মৃত্যুবাণ।

ইংরেজিকে গুরুত্বহীন করার ধারাবাহিক চেষ্টা

উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের পথ বেয়ে পরাধীন ভারতে ইংরেজি ভাষা ও তার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে নবজাগরণ এবং তার ধারাবাহিকতায় বিশ শতকে গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। সে দিন ব্রিটিশ শাসক ভারতীয়দের ইংরেজি শেখাতে চায়নি। চেয়েছিলেন এ দেশের মনীষীরা। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে কিন্তু বিজেপির অভিভাবক আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভার কণামাত্র অবদান ছিল না। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, তাদের লক্ষ্য ছিল মুসলমান বিরোধিতা।

সেই কারণে তারাও সেদিন ইংরেজি শিক্ষা পরিত্যাগের দাবি তুলেছিল। কেন না তারা জানত, ইংরেজি শিখে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শনে শিক্ষিত হলে একটি জাতিকে ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে একজোট করা কঠিন হবে। তবে এ দোষে শুধু উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাই দুষ্ট ছিল না, মুসলিম মৌলবাদী এবং কংগ্রেসের আপসমুখী নেতাদের অনেকেরই মনোভাব ছিল এই রকমই। স্বাধীন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তোলার কথা সংবিধানে লেখা থাকলেও বহু-ভাষাভাষী ভারতে সাধারণ মানুষকে ইংরেজি শিখতে না দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর আমল থেকেই। কেন না, স্পষ্টতই, আপামর সাধারণ মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সুযোগ উন্মুক্ত থাক এটা বিপ্লবভীত ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং তার সেবাদাস কংগ্রেস সরকার চায়নি।

স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চেষ্টা হয়েছে সারা দেশে নির্বিচারে সংযোগকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজির বদলে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার।

ইংরেজির প্রশ্নে সব শাসক দল এক সারিতে

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মরণে আছে, ১৯৭৭ সালে সিপিআইএম পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় বসেই শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি এবং পাশ-ফেল তুলে দিয়েছিল। তখন তাদের নেতারাও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ‘ইংরেজি বিদেশি ভাষা, ইংরেজি শিখতে চাওয়া বিদেশির গোলামির মানসিকতা’ এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মার্ক্সবাদবিরোধী। এর বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি) সারা রাজ্যের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী মানুষদের সংগঠিত করে সুদীর্ঘ উনিশ বছর আন্দোলন পরিচালনা করে ইংরেজি ফিরিয়ে আনে। তখন আমরা বারবার দেখিয়েছিলাম যে, ইংরেজি শুধু উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় তাই-ই নয়, ঐতিহাসিক কারণেই এ দেশে এই উন্নত আন্তর্জাতিক ভাষাটি সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা বা লিংক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে সারা দেশেই গৃহীত হয়েছে। এতে আমাদের ক্ষতি হয়নি, লাভই হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, ‘ইংরাজ হইতে এদেশের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার চর্চা যত হয় ততই ভালো’। নবজাগরণের অন্যান্য অনেক মনীষীদের অনুরূপ বক্তব্যও এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করে রাজ্যবাসীর কাছে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু এসব যুক্তিতে কর্ণপাত না করে সে দিন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুল থেকে ইংরেজি তুলে দেন। যদিও তাঁদের অধিকাংশই নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের পড়াতে শুরু করেন বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে। এমনকি সিপিএম নেতাদের অনেকে নিজেরাই ইংরেজিমাধ্যম স্কুল খোলা শুরু করেন। বস্তুত, ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পর এ রাজ্যে বেসরকারি স্কুল স্থাপন করে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার দিগন্ত খুলে যায়। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বহু সরকারি প্রাথমিক স্কুল ছাত্রশূন্য হতে হতে ধীরে ধীরে উঠে যায় এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলোতেও ছাত্র কমছে। শুধু উচ্চবিত্তই নয়, মধ্যবিত্ত এমনকি কিছু নিম্নবিত্ত ঘরেরও সন্তানদের ভর্তি করতে অভিভাবকদের প্রথম পছন্দের স্কুল হয়ে উঠেছে ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুল।

রাজীব গান্ধীর শিক্ষানীতিতেও ইংরেজি ছিল গৌণ

১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার যে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে, তাতেও বলা হয়েছিল, সাধারণ সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্ররা শুধু মাতৃভাষা, সহজ কিছু গণিত ইত্যাদি শিখবে। কিন্তু দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে ‘মডেল স্কুল’ বা ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’ গড়ে তোলা হবে যেখানে মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রকে ইংরেজি সহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোত্তম শিক্ষা দেওয়া হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শুধু বিজেপির অমিত শাহই নন, যখন যে দলই কেন্দ্রীয় সরকারে বসেছে, তারা প্রত্যেকেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক ইংরেজির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে এবং ইংরেজি শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করেছে।

ইংরেজি বিরোধিতার কারণগুলি

অমিত শাহদের ইংরেজি বিরোধিতার কারণ মূলত চারটি। প্রথমত, সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যাতে উচ্চশিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সুযোগ না পায়, ফলে উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষান্তে চাকরির যতটুকু সীমিত সুযোগ আছে তাও যেন শুধু ধনী ঘরের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত করে ফেলতে সুবিধে হয়। দ্বিতীয়ত, যাতে শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের পথ অবাধ হয় এবং তৃতীয়ত, ইংরেজির বদলে হিন্দি চাপিয়ে ‘হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান’ স্লোগানের আড়ালে হিন্দুত্বের বাহনে মুসলমান বিদ্বেষ এবং অন্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষ সমাজমননে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে হিন্দিবলয়ে ভোটে বাজিমাত করা যায়। চতুর্থত, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনে শিক্ষিত হয়ে যুবসমাজ পুঁজিবাদী শোষন-নিপীড়ণ অবসানকল্পে বিপ্লবী গণআন্দোলনে সংগঠিত হতে না পারে। অবশ্যই তাঁরা নিজেদের সন্তানদের ব্যয়বহুল বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াবেন। তারা ইংরেজিতে বাড়িতে কথা বললেও লজ্জিত না হয়ে গৌরববোধ করবেন। এই ইংরেজি এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধনী-মন্ত্রী ও উচ্চ আমলাদের সন্তানরাই হবে ভবিষ্যত ভারতের শাসক এবং শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সেবক। এরাই নানা সরকারি হোমরা চোমরা হয়ে ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

স্বয়ং অমিত শাহেরই পুত্র জয় শাহ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছেন। মন্ত্রীমশাই বলতে পারবেন কি, জয় শাহ সেখানে হিন্দিতে আলাপচারিতা করেন, নাকি ইংরেজিতেই অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন? এ জন্য তাঁর মহান হিন্দিপ্রেমী পিতৃদেবের লজ্জায় মাথা কাটা যায় কি?

একদিকে শিক্ষার সার্বিক গৈরিকীকরণের মাধ্যমে সনাতন হিন্দু ধর্ম, তার কুসংস্কার, পরধর্মবিদ্বেষ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, যুদ্ধোন্মাদনার মারাত্মক বিষ সমাজমননে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তারই পরিপূরক করে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বাহন ইংরেজি শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার এ এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র। বাংলা এর কুফল বুঝেছে। ভারত সাবধান।

তেলেঙ্গানায় ওষুধ কারখানায় শ্রমিকমৃত্যু দায়ী কে?

৩০ জুন তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলায় সিগাচি ওষুধ কারখানায় একটি চুল্লিতে বিস্ফোরণের ফলে ৪০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ও ২৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এই ওষুধ কারখানায় ব্যবস্থাপনার ভয়ঙ্কর গাফিলতির কথা। কারখানার চুল্লিগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করার মতো অতি প্রয়োজনীয় কাজটিও করা হত না। ফলে, যে চুল্লিটিতে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেটির তাপমাত্রা ৭০০-৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে গিয়েছিল। পরিণামে এই বিস্ফোরণ।

বর্তমানে দেশের বহু কল-কারখানায় একই রকম দুর্বিষহ অবস্থা। শিল্পক্ষেত্রের নিরাপত্তায় বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ভারত। একটি রিপোর্ট অনুসারে, গত বছর এ দেশে কর্মক্ষেত্রে দুশোটিরও বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে, প্রাণ হারিয়েছেন চারশো জনেরও বেশি শ্রমিক। আহত হয়েছেন অন্তত ৮৫০ জন। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের দুর্ঘটনার খবর নথিভুক্ত করা হয় না। দেখা গেছে, রাসায়নিক ও ওষুধ কারখানাগুলি বিশেষ ভাবে দুর্ঘটনাপ্রবণ। গত বছরে এই ক্ষেত্রদুটিতেই একশোটিরও বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি দুর্ঘটনাতেই উঠে আসে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মকানুন না মানা, শ্রমিকদের সুরক্ষাব্যবস্থার ঠিকঠাক তদারকি না হওয়া, শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না দেওয়া, কারখানা পরিদর্শন ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অবহেলা সহ নানা গাফিলতির ছবি।

প্রতিদিন আমাদের দেশে কোথাও না কোথাও মর্মান্তিকভাবে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে। কখনও বৃহৎ অট্টালিকা, জাতীয় সড়ক বা ব্রিজ তৈরি করতে গিয়ে, কিংবা কল-কারখানায় কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় নির্মমভাবে শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটছে। ৪০ বছর আগে ১৯৮৪ সালের ২ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের ভূপালে ঘটা ভয়ঙ্কর গ্যাস দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে। পাঁচ লক্ষ মানুষের জীবন সে দিন তছনছ হয়ে গিয়েছিল। বেসরকারি মতে দুর্ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই আট হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। সে দিন এক মার্কিন কোম্পানির চরম গাফিলতির কারণে এত মানুষকে মরতে হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, শ্রমিকদের জীবনের তোয়াক্কা না করে কলকারখানায় রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটিগুলো সে দিনও যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। এর মাশুল গুনে যেতে হচ্ছে সাধারণ নিরীহ শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে।

শ্রমিকদের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী যে কারখানা-মালিকরা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারকে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। কখনও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেও বহু ক্ষেত্রেই টাকার জোরে ঘুরপথে তারা মুক্তি পেয়ে যায়। কল-কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার হাল-হকিকত খতিয়ে দেখার কথা সরকারগুলির। এ ক্ষেত্রে সরকারেরও রয়েছে চরম উদাসীনতা। কোথাও নিরাপত্তা-ব্যবস্থার বেহাল দশা দেখেও মালিকের স্বার্থে সরকারি কর্তারা চুপ করে থাকেন। বিনিময়ে অনেকেরই মেলে মোটা টাকা উৎকোচ। পরিণামে মরে নাচার শ্রমিক। দিনকয়েক কান্নায় বুক ভাসায় তাদের পরিজনরা। তারপর আবার পা বাড়ায় নিরাপত্তাহীন মৃত্যুফাঁদ কারখানার দিকেই। পেটের ভাত জোগাড় করতে হবে যে!

কিন্তু এই ভাবেই কি প্রাণবলি দিয়ে যাবে শ্রমিকরা! তেলেঙ্গানায় শ্রমিকদের এই মৃত্যুমিছিল আবার প্রশ্ন তুলছে, সভ্যতা গড়ে তোলার কারিগর শ্রমিকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে যে সরকার-মালিক দুষ্টচক্র, তার প্রতিকার হবে কীসে? সমস্যার গভীরে তাকালে দেখা যায়, খরচ কমিয়ে মুনাফা বাড়াতে গিয়েই কারখানা-কর্তৃপক্ষ সুরক্ষাবিধিতে আপস করে। দৃশ্যত মালিক বা সরকার এ জন্য দায়ী হলেও, প্রকৃত বিচারে দায়ী মুনাফাভিত্তিক এই উৎপাদন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় শ্রমিক সুরক্ষায় গুরুত্ব দিতে সরকারকে তৎপর করতে হলে শ্রমিকদেরও সক্রিয় আন্দোলনে শামিল হতে হবে। সংগঠিত আন্দোলনে বাধ্য করতে হবে মালিকদের উপযুক্ত সুরক্ষা বিধি মানতে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 49 Bengali Weekly July 18, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

তিন সাংগঠনিক জেলায় নতুন সম্পাদক

দলের সাংগঠনিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে সদ্য অনুষ্ঠিত রাজ্য কমিটির সভায় অনুমোদনের ভিত্তিতে নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলায় কমরেড অঞ্জন মুখার্জী, ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলায় কমরেড বিশ্বনাথ সরদার এবং বারুইপুর সাংগঠনিক জেলায় কমরেড নিরঞ্জন নস্কর নতুন সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।

গুনায় স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট মিটার বসানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন মধ্যপ্রদেশে গুনার বাসিন্দারা। অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ৯ জুলাই গুনার বিদ্যুৎগ্রাহকরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি দাবিপত্র জমা দিলেন জেলাশাসকের দফতরে।

তাঁদের দাবি, জনসাধারণের প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে বেসরকারি কোম্পানিকে দিয়ে যে ভাবে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে, অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। স্মার্ট মিটার বসানোয় কী ভয়ঙ্কর ভাবে বিদ্যুতের বিল বাড়ছে, সমবেত গ্রাহকরা সেই বিপদের কথা তুলে ধরেন। সংগঠনের নেতা মনীষ শ্রীবাস্তব বলেন, সরকার বলছে, বিদ্যুৎ প্রতিটি নাগরিকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ সেই সরকারই স্মার্ট মিটার বসিয়ে চড়া বিল এনে বিদ্যুতের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করছে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন তিনি। সমাবেশে এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রবি বনজারা, নরেন্দ্র ভদৌরিয়া প্রমুখ।

কোতুলপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরে ধানকল গমকল লেদ গ্রিল প্রভৃতির চার শতাধিক ক্ষুদ্র শিল্পের গ্রাহকদের জোর করে স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে। এই স্মার্ট মিটার খুলে পূর্বের চালু মিটার বসানো এবং বর্ধিত ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে কোতুলপুর শিবানী লজে এক গ্রাহক কনভেনশন হয়।

নাগরিক মঞ্চের সভাপতি অমিয় গোস্বামীর সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। কনভেনশনের অন্যতম আহ্বায়ক তারাপদ গরাই প্রস্তাব পাঠ করেন। বক্তব্য রাখেন কোতুলপুর লেদ গ্রিল অ্যাসোসিয়েশনের ব্লক নেতা তারাপদ দে, ধানকল গমকল অ্যাসোসিয়েশনের নেতা স্বপন ব্যানার্জী, সমরেশ দালাল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তমাল নন্দ, অ্যাবেকার ব্লক সম্পাদক গোবিন্দ ঘোষ, জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ।

প্রধান বক্তা অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার দলমত নির্বিশেষে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়। এই অবস্থায় স্মার্ট মিটার খুলে আগেকার মিটার বসানোর আন্দোলন তীব্র করতে হবে। সুভাষ কর্মকারকে সম্পাদক ও তারাপদ দে-কে সভাপতি করে স্মার্ট মিটার প্রতিরোধ ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

মুঙ্গেরে জাতীয় শিক্ষানীতি বিরোধী বৈঠক

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির বিহার চ্যাপ্টারের উদ্যোগে মুঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে ১০ জুলাই এক আলোচনা চক্রে সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং সেভ এডুকেশন কমিটি প্রস্তাবিত জনগণের বিকল্প শিক্ষানীতি বিষয়ে আলোচনা করেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। সভা থেকে একটি কমিটি গঠিত হয়।

১০০ দিনের কাজের দাবিতে ভাতারে বিক্ষোভ

৮ জুলাই সারা বাংলা জব কার্ডধারী মজুর সমিতি পূর্ব বর্ধমানের ভাতার শাখার পক্ষ থেকে বিডিও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাদের দাবি, সমস্ত জব কার্ডধারীকে অবিলম্বে হাইকোর্টের রায় মেনে ১০০ দিনের কাজ দিতে হবে, নতুন জব কার্ড দেওয়ার কাজ শুরু করতে হবে। বকেয়া বেতন, প্রত্যেক গরিব মানুষকে বাংলা আবাস যোজনায় ঘর, সমস্ত গরিব মানুষের বাড়িতে শৌচালয় দেওয়া এবং ২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরির দাবিতে শতাধিক মানুষ এতে যোগ দেন।

অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক মোজাম্মেল হক বলেন, অবিলম্বে হাইকোর্টের রায় মেনে সমস্ত জব কার্ডধারীকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির জেলা সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুণ্ডু বলেন, একশো দিনের কাজ নিয়ে তৃণমূলের নেতারা ব্যাপক দুর্নীতি করেছে। এখনও বহু গরিব মানুষ তার কাজের ন্যায্য টাকা পায়নি। ফলে বকেয়া বেতন দিতে হবে এবং নতুন করে জব কার্ড করতে হবে।

উপস্থিত ছিলেন ব্লকের পক্ষে সব্যসাচী ঘোষ, তরুণ কুশমেটে, সোমা কুশমেটে প্রমুখ। প্রায় ২০০ জন জব কার্ডধারীকে কাজ দেওয়ার জন্য এবং নতুন জব কার্ড করার জন্য বিডিও-র কাছে আবেদন জানানো হয়।

শিক্ষকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ না করায় ক্ষোভ এস ইউ সি আই (সি)-র

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আজ ১৪ জুলাই নবান্ন অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন,

কিছু মানুষকে দুর্নীতির পথে চাকরি দেওয়ার পরিণামে সরকার হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের বঞ্চিত করেছে। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন।

আজ তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন ও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মুখ্যমন্ত্রী দেখা না করে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি।

হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার জীবনে যে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে তার দায় রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা সক্রিয় ভাবে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়ান এবং সরকারকে তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে বাধ্য করুন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদ এআইইউটিইউসি-র

ভিন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম তাদের স্থায়ী ঠিকানার ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার যে পরিকল্পনা ভারতের নির্বাচন কমিশন নিয়েছে, তার তীব্র বিরোধিতা করেছে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা ৭ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, এর ফলে দেশের কোটি কোটি নাগরিকের ভোটাধিকার বিপন্ন হবে। যদিও বলা হচ্ছে, ভিন রাজ্যে কর্মক্ষেত্রের এলাকার ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকবে, তবুও বছরে একাধিক রাজ্যে কাজ করা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কী হবে? কারণ আমরা জানি, পরিযায়ী শ্রমিকদের সিংহভাগই চুক্তিভিত্তিক, অনিয়মিত। এক রাজ্যে কয়েক মাস কাজ করার পরে তাঁদের আর এক রাজ্যে যেতে হয় রুজির জন্য। কোনও একটি বিশেষ রাজ্যে স্থায়ী ভাবে কাজের কোনও নিশ্চয়তা না থাকায় এই শ্রমিকদের অধিকাংশকেই বছরে তিন চার রাজ্যে কাজ করতে যেতে হয়। এঁদের নাম কোন রাজ্যের ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে? এর ফলে বাস্তবে কোটি কোটি মানুষ হারাবেন তাদের ভোট দেওয়ার বা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার।

শুধু তাই নয়, এই মানুষদের নাগরিকত্বের অধিকারও প্রশ্নচিহ্নের সামনে পড়বে। নাগরিকদের বে-নাগরিক করারও এ এক অপকৌশল, যা এনআরসি-সিএএ-র মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার করতে চাইছে। এই কুৎসিত ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করতে আমরা পরিযায়ী শ্রমিক সহ সকল শ্রমজীবী মানুষের কাছে আহ্বান করছি।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com